Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রথম মুসলিম রবীন্দ্র-সমালোচক

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	October 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v34i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.2
Pages	21-48
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রথম মুসলিম রবীন্দ্র- সমালোচক

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

রবীন্দ্রসাহিত্যের আদি সমালোচকদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মৌলবী একরামদ্দীন। বস্তুতঃ তিনি মুসলমান সমালোচকদের মধ্যে প্রথম রবীন্দ্র সমালোচক। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে আজকের দিনের অনেক রবীন্দ্রভক্তরবীন্দ্র সমালোচক হিসাবে একরামদ্দীনের নাম জানেন না। আমরা একরামদ্দীনের ''*রবীন্দ্র প্রতিভা*'' গ্রন্থটি পাঠ করলে সমালোচক একরামদ্দীনের প্রতিভা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হই। রবীন্দ্র-সমালোচক হিসাবে একরামদ্দীন যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

মৌলবী একরামদ্দীন বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার কুলিয়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী করতেন। '*রবীন্দ্র প্রতিভা*' গ্রন্থ রচিত হয় ১৯১৪ সালে, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৯২১সালে। আসলে এটি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ; ১৯১১ সালে রচিত বলে লেখক তার গ্রন্থের একস্থলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের '*বিসর্জন*' নাটকের বিস্তৃত আলোচনা আছে এ গ্রন্থে।*বিসর্জন*' নাটকের আলোচনার পূর্বে আছে ''প্রস্তাবনা''। এই প্রস্তাবনায় আছে কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখকের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা আছে এই অংশে। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই প্রবন্ধটি ''বীরভূম সাহিত্য পরিষদে পাঠ করার জন্য ১৩১৮ (১৯১১) সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত বাবু শিবরতন মিত্র মহাশয়ের কাছে সমর্পণ করেন।'' ১৯৩০ সালে তাঁর দ্বিতীয় সমালোচনা গ্রন্থ *কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র* প্রকাশিত হলে সমালোচক হিসাবে একরামদ্দীন খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর দুটি উপন্যাসও আছে--'*কাঁচ ও মণি,*' ও'*নতুন মা*'। এই

দুটি নীতি ও আদর্শ প্রচারমূলক উপন্যাস *সওগাত* পত্রিকায় তাঁর অপর উপন্যাস '*জীবনপণ*' (১৩৩৩) মুদ্রিত হয়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় '*চাঁদ মিঞার খাতা*' নামে একটি রম্য রচনাও প্রকাশিত হয়। '*অনধিকার প্রবেশ*' নামে তাঁর একটি ক্ষুদ্র নাটকও প্রকাশিত হয়। '*বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩২৫ শ্রাবণ) তাঁর '*সবল ও দুর্বল স্বার্থ*' নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। *সওগাতে* (১৩৩৩) '*আমার হিরোইন,*' '*মনোনীতা পাত্রী,*' '*বড় হুজুর,*' '*নিরুদ্দেশ,*' '*রাঙাবর,*' '*ভিক্ষুক*' প্রভৃতি গল্প মুদ্রিত হয়। *মোহাম্মদী* (১৩৩৫) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় '*রূপের মোহ,*' *দেশোদ্ধার, সুন্দরী বড়লোকের মেয়ে, জাতিচ্যুতা, সুবর্ণের মহিমা, পিতার ভুল, ভুল, সন্দেহ, কুরূপা* প্রভৃতি গল্প। একরামদ্দীনের গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে তাঁর- সমালোচনা- পুস্তক' '*রবীন্দ্র প্রতিভা*' আজকের দিনে একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। অথচ সে যুগে (১৯১৪-১৯২১) রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থ খুব বেশী ছিল না। যদিও সেকালে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচক সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। একরামদ্দীনের এ গ্রন্থ বলা যেতে পারে রবীন্দ্রসাহিত্যের আদি সমালোচনা। *শান্তি নিকেতন পত্রিকায়* (১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৩৩৬ সালের *প্রবাসী* পত্রিকায় আছে নীহাররঞ্জন রায়ের আলোচনা, আর টমসন সাহেবের গ্রন্থ (ইংরেজিতে) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ এ (Rabindranath)।

এ সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে আমরা একরামদ্দীনকে রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন আদি সমালোচক বলেই অভিহিত করতে পারি।[২]

একরামদ্দীনের '*রবীন্দ্র প্রতিভা*' প্রকাশিত হয় বর্ধমানের উকীল মৌলবী নাজিরদ্দিন আহমদ বি. এ. বি. এল. কর্তৃক। পুস্তকটি মুদ্রিত হয় কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার সাম্য-যন্ত্রে--পুস্তকের মুদ্রাকর সেখ আবদুল লতিফ। পুস্তকটির মূল্য মাত্র ১টাকা। পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৯ এবং সাইজ ডবল ক্রাউন ১/ ১৬। ভিতরের মলাটে পুস্তকের শিরোনামের নীচেই রবীন্দ্রনাথের *চিত্রা* কাব্যের 'সাধনা' কবিতার ৪টি লাইন উদ্ধৃত হয়েছে:

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।

তারপর আছে গ্রন্থকারের নিবেদন:

''আমি প্রথম উদ্যমেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনারূপ দুরূহ কার্যে কেন ব্রতী হইলাম তাহা অনেকবার চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু কারণ খুজিয়া পাই নাই। যেমন হৃদয় ভারাক্রান্ত হইলে মানুষ সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক আপনার বক্তব্য না বলিয়া থাকিতে পারেনা, আমারও বুঝি তদ্রূপ। আমার মনে যাহা আসিয়াছিল, তাহাই লিখিয়াছিলাম। ইহা যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই।
...

''আমি কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান করায় প্রুফ দেখার ভাল সুবিধা হয় নাই। এই নিমিত্ত পুস্তকে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে...আশা করি পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক আমার এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।''

পুস্তকটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর সুহৃদবর 'শ্রীযুক্ত মৌলবী হামিদর রহমান সাহেবের করকমলে--''। একরামদ্দীনের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে হামিদর রহমানের কি সম্পর্ক তা জানা যায় না। এবং এই হামিদর রহমানের পরিচয়ও জানা যায় না। উৎসর্গ পত্র এরূপ ছিল:

উপহার।

সুহৃদবর,
শ্রীযুক্ত মৌলবী হামিদর রহমান সাহেবের
করকমলে--

প্রিয় হামিদর রহমান সাহেব,
আপনার করে রবীন্দ্র-প্রতিভা অর্পণ করিলাম। আপনি যে আমার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অশেষ উপকার করিয়াছেন তাহার প্রতিদান সম্ভবপর কিনা জানি না। আমি তাহার প্রতিদান করিতেছি না, তাহা স্মরণ রাখিতেছি মাত্র।

বিনীত
একরামদ্দীন।

পুস্তকটির শুরুতে আছে 'প্রস্তাবনা'। 'প্রস্তাবনায়' রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে বাংলা কাব্য-জগতের বিপ্লবী কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তিনি অনেক নূতন কথা বলেছেন। পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অনেক। পূর্বতন কবিদের সম্পর্কে

একরামদ্দীনের মন্তব্য ''এরূপ, ''পূর্ববর্তী কবিগণ মিশ্রিত ভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রকর। রবিবাবু বিশ্লিষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রকর। পূর্ববর্তী কবিগণ ভাব ও সৌন্দর্য হইতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার শোভা দেখিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ ভাব ও সৌন্দর্যের মধ্যে একান্তভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহা বিশ্লেষণ করিতেছেন।''

সমালোচক একরামদ্দীন যে কথাটি বলতে চেয়েছেন--তা হলো এই যে গীতি কবিতা বা lyricism-এর চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিগণ muse বা কবিতাসুন্দরীর কাছাকাছি যেতে সাহসী হননি। দূর থেকে প্রণত হয়ে করুণা ভিক্ষাপূর্বক কার্যারম্ভ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতাসুন্দরী জীবন-সঙ্গিনী বা প্রণয়িনী। কবিতাসুন্দরী বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের ''খেলার সঙ্গিনী এবং যৌবনে মর্মের গেহিনী।'' যৌবন-কালে রবীন্দ্রনাথ আবার বলেন--

কবে কোন ফুল্ল যূথীবনে
বহু বাল্যকালে দেখা হত দুইজনে
আধ চেনা শোনা।

বাল্যকালের দেখা শোনা যৌবন পর্যন্ত চলেছে:

জীবনের বনে যৌবন-বসন্ত যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস
মুকুলিয়া উঠিতেছে নবনব আশ.
সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে।

যুবক কবি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেন:

খেলা ক্ষেত্র হতে
কখন অন্তর লক্ষ্মী এসেছে অন্তরে-
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসিয়াছে মহিষীর মত।

কবিতাসুন্দরীর সঙ্গে পূর্ণ মিলনের ফলেই কি কবি বলতে পেরেছেন:

বীণা ফেলে দিয়ে এস মানসসুন্দরী
দুটি রিক্ত হস্তে শুধু আলিঙ্গন ভরি

কণ্ঠে জড়াইয়া দাও—মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে—মর্মান্ত হরষে
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ...

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম স্তরে আমরা কি দেখি—আমরা দেখি যে সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অনুভূতি বা ভাবনা আছে। *কড়ি ও কোমলের* যুগে তা দেহ আশ্রিত, কিন্তু *সোনারতরী* বা *চিত্রার* যুগে তা অন্যরকম। একরামদ্দীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী কবিদের একটি তুলনাও করেছেন:

''দেবীর অনুগ্রহকণা লাভ করিবার নিমিত্ত স্তবগান করিতে হইয়াছে—সেই দেবী রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে বসিয়া প্রণয়িনীরূপে আলিঙ্গন দানে উদ্যতা—ইহার কারন কি? রবীন্দ্রনাথ কবিতা-সুন্দরীকে আপনার বলিয়া চিনিয়াছেন, কবিতা-সুন্দরীও নিবিড়তম সম্বন্ধের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের আপনার হইয়াছেন।'' কবিতার ভাব যথার্থ বুঝতে না পারার কারণ হিসাবে একরামদ্দীন বলেন যে 'কবিতার অসম্পূর্ণতা নহে—বরং আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের সহৃদয়তায় সমগ্রতার অভাব।'' কাব্যরস আস্বাদন কবরার ক্ষমতা সকলের থাকে না। কোন কবিকে তার কবিতাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে পাঠকেরও সহাভূতিশীল হৃদয় থাকা চাই। সমালোচক শেষে বলেছেন যে নূতন কালের কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে। সমালোচকের দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ যে নূতনের বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি সফল হয়েছেন। পুরাতন কাব্যরীতির বদল হয়েছে, নূতনের পালা শুরু হয়েছে। বিশ্বের নিয়মও তাই। পুরাতন চলে যায়—নূতনের জন্য জায়গা করে দিয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই প্রস্তাবনার উপসংহার করেছেন সমালোচক একরামদ্দীন—

হেথা হতে যাও পুরাতন
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে—
আবার বাজিছে বাঁশী আবার উঠিছে হাসি
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার পর মূল পুস্তক শুরু হয়েছে: পুস্তকের নাম *'রবীন্দ্র-প্রতিভা'* (বিসর্জন)। সমগ্র পুস্তকটি মোট চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১২৯—আর প্রস্তাবনা হচ্ছে ১৩ পৃষ্ঠা। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের একটি নামকরণ করেছেন একরামদ্দীন। যেমন: প্রথম পরিচ্ছেদের নাম নানা

কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--পিশাচ শক্তির বল সঞ্চয়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ--দেব শক্তির বলসঞ্চয়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ--দেবশক্তির সহিত পিশাচ শক্তির সংঘর্ষ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ--সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--বাহ্যশক্তির সহায়তায় সত্যের জয়লাভ, সপ্তম পরিচ্ছেদ--পিশাচের অন্তঃশক্তির পরাক্রম, অষ্টম পরিচ্ছেদ--বিশ্ব প্রেম ও ভক্তি, নবম পরিচ্ছেদ--মনুষ্যত্ব ও সংস্কার, দশম পরিচ্ছেদ-বায়ুতাড়িত গোলক, একাদশ পরিচ্ছেদ--মৃগ ও ব্যাধ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-পথিকের পান্থশালা ও দেবতার গৃহ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ--পাপের সম্মুখে পাপী, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ--অপরাধী ও বিচারক, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ--দেবের বাহ্যশক্তির প্রতিক্রিয়া, ষোড়শ পরিচ্ছেদ--পিশাচের বাহ্যবলের প্রতিক্রিয়া, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ--মধুহীন পুষ্প, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ--পৈশাচিক শক্তির প্রতিক্রিয়ার ফল, ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ--মানব সমাজের স্বার্থপরতা, বিংশতি পরিচ্ছেদ-সমাজচ্যুতা অপর্ণা, একবিংশতি পরিচ্ছেদ--দেবভাব ও পিশাচভাব, দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ--পাশব বা পৈশাচিক যুদ্ধের ফলাফল, ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ--কাব্য আলোচনা, চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ--নাম-মাহাত্ম্য।

প্রথম পরিচ্ছেদে *সমালোচক আত্মচিন্তা'* ও 'পরার্থচিন্তা' বা সর্বানুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সর্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ তিনি সমগ্র বিশ্বকে আত্মীয় মনে করতেন। এজন্যে ''তৃণলতা ধূলিকণা তার সগোত্র কুটুম্ব।'' কবিতা লিখতে গেলে বা বুঝতে গেলে যে দুটি গুণ আবশ্যক তা হচ্ছে সহানুভূতি বা ভাব প্রবণতা, এবং সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা। সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে সকল কবি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই উভয় গুণের অস্তিত্বের অনুপাত সমান নয়। কারো মধ্যে সহানুভূতির ভাগ অধিক, কারো মধ্যে সৌন্দর্য গ্রহণ ক্ষমতা অধিক; বিপরীত দিকে কারো মধ্যে সহানুভূতি কম এবং সৌন্দর্য গ্রহণ ক্ষমতাও কম--আবার কারো কারো ক্ষেত্রে সহানুভূতি বেশী, সৌন্দর্য গ্রহণ ক্ষমতা কম, বিপরীত দিকে সহানুভূতি কম, সৌন্দর্য গ্রহণ ক্ষমতা বেশী। সমালোচক একরামদ্দীনের মতে রবীন্দ্রনাথে উভয় গুণের সংমিশণ থাকলেও তাঁর সৌন্দর্য গ্রহণ ক্ষমতাই অধিক। সমালোচকের মন্তব্য লক্ষ্য করা যাক:

> রবীন্দ্রনাথ ভাবকে করতলস্থ করিয়া এবং বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাকে পৃথক কিরয়া লোকচক্ষুর অগোচর সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছেন।...নিজে না কাঁদিয়াও অপরকে কাঁদান সম্ভব, নিজে অনুভব না করিয়াও অপরের অনুভূতি উদ্রেক করা সম্ভব।

'*বিসর্জন' নাটক* প্রসঙ্গে প্রথম পরিচ্ছেদে একরামদ্দীনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ''রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' পবিত্রভাবমূলক নাট্য কাব্য হইলেও ইহাতে কবির ভাবপ্রবণতার পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। একটি প্রধান ভাবকে অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কবির নিজের ভাবাবেশ ঘটে নাই এবং পাঠকেরও ঘটে না। 'বলিদান অধর্ম' এই পবিত্র ভাব তাঁহার গ্রন্থের মূলমন্ত্র হইলেও ইহাতে সহানুভূতিমূলক করুণ সুরের ক্রন্দন নাই।''

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই প্রকৃতপক্ষে '*বিসর্জন*' নাটকের আলোচনা বা সমালোচনা শুরু হয়েছে বলা যায়। রানী গুণবতী নিঃসন্তান। এত সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তিনি অসুখী। তাই তিনি মন্দিরে দেবী মায়ের কাছে আপনার মনোবেদনা জানাতে এসেছেন:

...ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু––পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আর একটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব––

রাজপুরোহিত রঘুপতির সহায়তায় মন্দিরে 'গুণবতীর' নামে পূজা হবে এবং বলি দেওয়া হবে এই স্থির হলো। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনার শুরুতেই আমরা দেখবো ভিখারি বালিকা অপর্ণা তার হারানো ছাগ-শিশুর সন্ধানে মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর সেখানেই রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো অপর্ণার। রাজা গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরের সেবক ও রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহের কাছে অপর্ণার হারানো ছাগ–শিশুর সন্ধান জানতে চাইলেন। জয়সিংহ জানালো মন্দিরে বলিদানের জন্য পশু কত স্থান থেকে সংগৃহীত হয় তার সঠিক সংবাদ কেউ রাখে না। এদিকে অপর্ণা মন্দির সোপানে রক্তচিহ্ন দেখে চিৎকার করে উঠল–– অপর্ণার [illegible]র জয়সিংহের হৃদয় স্পর্শ করলো––তখন জয়সিংহও বলে––

আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর!

বালিকা অপর্ণার দুঃখে রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহ দুজনারই হৃদয় দ্রবীভূত হলো। জয়সিংহের হৃদয়ে সহসা 'অপরূপ বেদনা' জেগে উঠে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য বুঝতে পারলেন--জয়সিংহ আর অপর্ণার মধ্যে প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই যখন অপর্ণা জয়সিংহকে মন্দির ছেড়ে আসতে বলে--তখন জয়সিংহ প্রত্যুত্তরে বলে--''কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে? কোথায় আশ্রয় আছে?'' তখন গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জবাব দেন--''যেথা আছে প্রেম।'' জয়সিংহের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, কোথা আছে প্রেম? এ প্রশ্ন মনে তার। প্রেম তো অজ্ঞাতসারেই এসে হৃদয়মন অধিকার করে নেয়। তাই জয়সিংহ বলে:

অয়ি ভদ্রে, এসো তুমি
আমার কুটিরে। অতিথিরে দেবী রূপে
আজি কে করিব পূজা করিয়াছি পণ।

ত্রিপুরা-অধিপতি গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যে বলিদান নিষেধ করে রাজাজ্ঞা প্রচার করলেন। আর রাজপুরোহিত রঘুপতি বলি প্রথা চালু রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই বিরোধই বিসর্জন নাটকের মূল উপজীব্য। ধর্মের অর্থহীন অন্ধ সংস্কার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে নিত্যকালের মানব ধর্মের বা হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব *বিসর্জন* নাটকের মূল বক্তব্য। নাটকের প্রথমেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখিয়েছেন। রঘুপতির মধ্যে এই মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধ-সংস্কার প্রচণ্ড শক্তিরূপে প্রকাশিত। রানী গুণবতীর স্বার্থ বিজড়িত সংস্কার ও প্রথাগত ধর্মবোধ রঘুপতিকে সহায়তা করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ-ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের সিংহাসন লোভ, অপর দিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য সত্যধর্ম ও চিরন্তন হৃদয়কর্মকে বুকে স্থান দিয়ে অটল পর্বতের মত দণ্ডায়মান। আর তার পাশেই হৃদয়হীন প্রথার প্রতিবাদকারিণী প্রেম ও হৃদয়বৃত্তির মূর্তিমতী প্রতীক অপর্ণা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে রয়েছে জয়সিংহ-- পিতৃমাতৃহীন এক বালক-- পুরোহিত রঘুপতির পালিত পুত্র। দুই পক্ষের প্রতি ছিল তার সমান আকর্ষণ--তার এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়নি ইহজীবনে--আত্ম বিসর্জনের মধ্যেই তার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি। ইংল্যান্ড বা ইউরোপের ইতিহাসেও আমরা দেখি স্টেট বনাম চার্চের অর্থাৎ রাজশক্তি ও যাজক

সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন প্রভুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে। এদেশেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ '*বিসর্জন*' নাটকে সেই কথাটিই বলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা '*রাজর্ষি*' উপন্যাসেরই নাট্যরূপ এই '*বিসর্জন*'। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজপুরোহিত রঘুপতি এই দুইয়ের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী '*বিসর্জন*' নাটকের আখ্যানবস্তু। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এ নাটকের প্রধান চরিত্র--গুণবতী অপর্ণা কিন্তু মোটেই ঐতিহাসিক নয়।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য বলি বন্ধের আদেশ জারী করলেন। কিন্তু রঘুপতি তা মানলেন না। '*রবীন্দ্র-প্রতিভা*' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে একরামদ্দীন সেই সংঘর্ষের কথাই বর্ণনা করেছেন। এই পরিচ্ছেদের নামকরণও করেছেন সমালোচক-- ''দেবশক্তির সহিত পিশাচ শক্তির সংঘর্ষ''। রঘুপতি রাজসভায় এসে বললেন-- ''রাজার ভাণ্ডারে। এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে''। তখন রাজা দৃপ্তকণ্ঠে বললেন--

> ''মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
> হইল নিষেধ।

সভার সকল সদস্য--সেনাপতি, মন্ত্রী সবাই বিস্মিত ও হতভম্ব। কিন্তু পর মুহূর্তেই সভাসদবৃন্দ প্রতিবাদ জানালেন। এমন কি রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ও। রাজসভার সকলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজা অটল নির্বাক। রঘুপতি রাজাকে নানাবিধ কদর্যভাষায় তিরস্কার করলেন। কিন্তু রাজা ধীর স্থির---নির্বাক। তিনি বললেন--

> ''ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
> মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
> পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুরারাজ্যে
> যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
> পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

এদিকে রানী গুণবতীও সন্তান কামনায় যে পূজার বলি পাঠিয়েছিলেন--মন্দির থেকে তা ফিরে এল। রানীও প্রথম জানতে পারেন নি— কার আজ্ঞায় পূজা হলো না। রাজার কাছ থেকেই রানী জানতে পারলেন--তারই আজ্ঞায় বলি বন্ধ হয়েছে। তখন রাজার সঙ্গে রানীরও দ্বন্দ্ব শুরু হলো। অর্থাৎ রাজার সংঘর্ষ শুধু বাইরে নয়—

ঘরেও আরম্ভ হয়ে গেল। রাজা ও রানীর ভালবাসার মধ্যে আর এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। সেটা হলো সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব।

একরামদ্দীন যথার্থই বলেছেন: ''উভয়ের হৃদয়ের গতি বিপরীত দিকে--সুতরাং পুনরায় ব্রাহ্মণের অধিকার লইয়া তর্ক উঠিল। রানীর অভিমান ব্যর্থ হইয়াছে, তাই তিনি এবার অনুনয় বিনয় ও প্রেমের দোহাই দিয়া রাজাকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।''

রাজাকে প্রস্থান করতে বললেন রানী। রানী তখন নৈরাশ্যের মধ্যেও বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে থাকলেন।

আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান--হয় ধূলিতলে নতশির, নয়
উর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

রঘুপতি সেনাপতিকে প্ররোচিত করতে থাকে। এমন কি সাধারণ নগরবাসীদেরও রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এদিকে রানীর অনুচরেরা পূজার উপকরণ নিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হলো। রাজা সেনাপতি নয়ন রায়কে বলি নিষেধ করার জন্য মন্দিরে যেতে আদেশ করলেন। কিন্তু নয়ন রায় রাজাজ্ঞা পালন করতে অস্বীকার করলেন--বললেন, রাজাজ্ঞা মন্দিরে প্রযোজ্য নয়। অগত্যা রাজা বাধ্য হয়ে নয়ন রায়কে পদচ্যুত করে চাঁদ পালকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। রঘুপতি নিশ্চুপ হযে বসে থাকলেন না। রঘুপতি রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্বলচিত্ত নক্ষত্র রায়কে উত্তেজিত করতে থাকেন। নক্ষত্র রায়কে রঘুপতি বলেন:

কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে। রাজা

নক্ষত্ররায়কে রঘুপতি আরও বুঝালেন যে, দেবী রক্ত পিপাসু হয়েছেন--দেবী রক্ত চান। রক্ত ছাড়া চলবে না। নক্ষত্র রায় কিন্তু প্রথম রঘুপতির এ ইঙ্গিত বুঝতে পারেন নি। রঘুপতি পরে তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ঘরেই রাজরক্ত আছে —অর্থাৎ রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রক্তই দেবী চান।

রঘুপতি অত্যন্ত চতুর এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তিনজন ব্যক্তির হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে একই কার্যের জন্য তাদের নিয়োজিত করলেন। সন্তানহীন নারীকে পুত্রলাভের আশা, প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী নয়ন রায়কে

ধর্ম রক্ষার ব্যবস্থা এবং দুর্বলচিত্ত নক্ষত্র রায়কে রাজ্য লাভের প্রলোভন দেখিয়ে রঘুপতি তার উদ্দেশ্য সফল করতে চাইলেন। এদিকে জয়সিংহ ভ্রাতৃহত্যার চক্রান্ত শুনে বিচলিত হয়ে উঠল। রঘুপতি জয়সিংহকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন--জগতে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই, আত্মপর ভেদ জ্ঞান মিথ্যা। কে কার ভ্রাতা--কে কার পিতা--হত্যাকান্ড পাপ নয়।

হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহবরে,
অগাধ সাগর-জলে নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে--
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে

জয়সিংহের মনেও একটা সংকটের সৃষ্টি হলো। দেখা দিল উভয় সংকট। ন্যায়-অন্যায় বোধ আর গুরুভক্তি এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তারও হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

মন্দিরে জয়সিংহ একা। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধে রত। অপর্ণা এসে উপস্থিত হলো তার সামনে। রঘুপতি এসে ছলে বলে অপর্ণাকে মন্দির থেকে বিতাড়িত করলেন। রাজ-হত্যার জন্য যে ছুরি তা-ও দেখালেন জয়সিংহকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মেলার দিনের বর্ণনা আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। জনগণ রাজার প্রতি বিরূপ, কেননা রাজা বলি বন্ধ করে দিয়েছেন। রঘুপতি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন-দেশে মড়ক আসছে--তিনমাসের মধ্যে দেশ উচ্ছন্নে যাবে।

সেনাপতি চাঁদপাল রাজাকে রঘুপতির ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দিলেন। রাজা প্রথমে বিস্মিত হলেন। মন্দিরে এসে গোবিন্দমাণিক্য একা একা ভাবছেন--ভ্রাতা বিদ্রোহী, পতিপ্রাণা পত্নী বাম--এরূপ অবস্থায় জীবনে সুখ শান্তির আশা কি? শেষ পর্যন্ত গোবিন্দমাণিক্য প্রাণদানের সংকল্প করলেন।

বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা। ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা
...এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক।

রাজহত্যায় প্রজার প্রাণ কেঁদে উঠবে--ভ্রাতৃহত্যায় ভ্রাতার প্রাণ কাঁদবে--তখনও কি প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হবে না? রাজা এভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভার এক চরম নিদর্শন '*বিসর্জন*'। এর প্রতিটি চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ--চরিত্রগুলির মনোজগতের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতকে রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন রাজা একা দণ্ডায়মাণ। জয়সিংহও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রঘুপতির কাছে--সে রাজরক্ত এনে দেবে। জয়সিংহ দেবীকে জিজ্ঞাসা করছে:

বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই।
এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে, বল্

হঠাৎ নেপথ্য থেকে জবাব এল--'চাই'। তখন জয়সিংহ রাজাকে গিয়ে বলছে--তার কাল উপস্থিত। মৃত্যুর জন্য রাজা প্রস্তুত হোন। দেবীর আদেশ এসেছে। নিজ কর্ণে কি রাজা তা শ্রবণ করেননি। গোবিন্দমাণিক্য তখন উত্তর দিলেন--দেবীর আদেশ নয়--আড়াল তেকে রঘুপতি এ কথা বলেছেন। রঘুপতির কণ্ঠস্বর তার পরিচিত। জয়সিংহ আবার সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলো--

--নহে নহে, আর নহে,
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে!

জয়সিংহের চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল না। তাই রঘুপতির এত প্ররোচনা সত্ত্বেও প্রথমবারের মত সে ব্যর্থ হলো। মন্দির থেকে গোবিন্দমাণিক্য নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই রঘুপতি আবির্ভূত হলেন। আবার রঘুপতি জয়সিংহকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন:

আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উপায় বের করলেন। প্রতিমার মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। প্রজাদের বলা হলো—দেবী বিমুখ হয়েছে। এর মধ্যে অপর্ণার আবির্ভাব হলো মন্দিরে। সে সহজ বুদ্ধিতে যা বুঝে তা এই, দেবী-প্রতিমার মুখ নিশ্চয়ই কোন লোক ঘুরিয়ে দিয়েছে। সে প্রতিমার মুখ আবার ঠিক মত রেখে দেয়। জয়সিংহের মনে আবার সন্দেহ সংশয়। তাহলে বার বার রঘুপতি এসব হীন কার্য করছে। অপণা জয়সিংহকে আবার বললো— মন্দির ছেড়ে চলে এসো। জয়সিংহ রঘুপতিকে আবার প্রশ্ন করে—

> সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ,
> সত্য
> রঘুপতি কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য
> বলিবারে?

রঘুপতি শেষ চেষ্টা করে,

> মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
> মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
> সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
> নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
> চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে—কেহ
> নাহি জানে তারে। কেহ নাহি পায় তারে।
> সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
> ফাটিয়া পড়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সেনাপতি চাঁদপাল রাজাকে বললেন—প্রজারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রস্তাব মোগল সেনাপতির কাছে পাঠিয়েছে। এদিকে রঘুপতি নক্ষত্র রায়কে সম্পূর্ণ বশ করে ফেলেছে—

> যেথা যাই সকলেই বলে 'রাজা হবে,'?
> 'রাজা হবে?'—এ বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড...

নক্ষত্ররায়ের মনের এই অবস্থার বিবরণ একরামদ্দীন এভাবে দিয়েছেন:

> ক্ষিপ্ত কুক্কুরের বিষ মনুষ্যকে যেমন দিবারাত্র কুক্কুরের মূর্তি দেখায় রঘুপতির অন্তঃশক্তিও নক্ষত্ররায়কে সেইরূপ কেবল রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখাইতেছে। রঘুপতির তীব্র বিষ নক্ষত্রের মস্তিষ্কে উঠিয়াছে।'' [পৃ ৬৬]

রাজা গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে ডেকে তার হাতে তরবারি দিয়ে নিজের বক্ষ উন্মোচন করে তাকে হত্যা করতে বললেন—

এই বক্ষ করে দিনু
দ্বারা, এই নে আমার তরবারি, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম!

সমালোচক একরামদ্দীন এখানে এ দৃশ্যের সঙ্গে নেপোলিয়নের জীবনের একটি ঘটনার তুলনা দিয়েছেন। নেপোলিয়নের বিরোধী দশ সহস্র সৈনিকের বন্দুক যখন সেনাপতির আদেশে নেপোলিয়নের বক্ষঃস্থল ভেদ করতে উর্দ্যত হয়েছিল তখন নেপোলিয়ন নতজানু হয়ে বক্ষঃস্থল উন্মোচনপূর্বক বলেছিলেন—যদি নেপোলিয়নকে বধ করাই তোমাদের অভিপ্রেত হয় তবে এই বক্ষ অনাবৃত করলাম, গুলি কর। এই কথা বলা মাত্র দশসহস্র বন্দুকই সৈনিকগণের হস্তচ্যুত হয়ে ভূতলে পড়ে গেল।

গোবিন্দমাণিক্যের আত্মসমর্পণে নক্ষত্ররায়াও অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেণ।

এদিকে রানীও অভিমান করে থাকলেন। তিনি কিছুদিন রাজার প্রতি কঠিন আচরণ করবেন স্থির করলেন। প্রেমের তৃষ্ণার পরে রাজা আপনি ধরা দেবেন—পালিত পুত্র ধ্রুব রাজার সমস্ত স্নেহ কেড়ে নিচ্ছে দেখে তা রানীর অসহনীয় হয়ে উঠলো। নক্ষত্ররায়কে রানী গুণবতী ডেকে আনলেন। নক্ষত্ররায়ের চরিত্রে যে দৃঢ়তার অভাব ছিল সেটি আবার প্রমাণিত হলো। রানী বললেন—

ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে

শেষে রানী বললেন—

... অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেব রোষানল; স্থায়ী হবে
সিংহাসন। এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার।

রানী মনে করেছিলেন, ধ্রুবকে বলি দিলে তার সন্তানকামনার পরিতৃপ্তি ও ভাবী সন্তানের অংশভাগীর উচ্ছেদ—এই দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে।

জয়সিংহের হৃদয়ে শেষে যুক্তি প্রাধান্য লাভ করে এবং ভক্তির কৃত্রিম বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। একাদশ পরিচ্ছেদে সমালোচক একরামদ্দীন এই কথাটি অতি সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দেবীর কাছে চিৎকার করে জয়সিংহ জানতে চায়—

ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস, আছি'—নাই, নাই নাই, দেবী নাই!

জয়সিংহের সম্মুখে বাহ্যজগৎ পুনরায় মানবী অপর্ণা রূপে দেখা দিয়ে তার হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে দিল। অপর্ণার স্বরূপ বুঝতে পেরে তার হৃদয় এখন আবেগশূন্য হয়ে স্থির হয়েছে।

...তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!--
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না!
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে—
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।

একরামদ্দীন এই পরিচ্ছেদের (একাদশ) নামকরণ করেছেন—''মৃগ ও ব্যাধ।'' জয়সিংহ হচ্ছে মৃগ আর অপর্ণা ব্যাধ স্বরূপিণী। ''ব্যাধ সত্য স্বরূপিণী দেবীরূপে পিশাচ ধর্ম এবং মনমোহিনী মানবীরূপে মানব হৃদয়ে মৃগয়া করেন এবং উভয় রূপেই কাহাকেও—বা ধৃত করিয়া লইয়া যান এবং কাহাকেও-বা বধ করিয়া ফেলিয়া যান। জয়সিংহকে তিনি দেবী ও মানবী উভয় রূপেই ধৃত করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।''

মৃগ জয়সিংহ যে ধরা দিবার জন্য ব্যগ্র তা বুঝাবার জন্য বললো—
অপর্ণা, বলিকা। দেবী নাই!
অপর্ণা বা ব্যাধ উপযুক্ত সুযোগ বুঝে ডাক দেয়—
জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে।

ব্যাধের আহবান স্বেচ্ছামৃগের প্রতিজ্ঞা পালন রূপ কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিল। তার ভক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বন্ধন এখনও অবশিষ্ট আছে। জয়সিংহ অপর্ণার আহ্বানের জবাবে বলে—

যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব...

এদিকে ধ্রুবকে বলি দিতে গিয়ে নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি উভয়ে রাজার প্রহরী কর্তৃক ধৃত হলো এবং তাদের উভয়কে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হলো। তবে রঘুপতি রাজার কাছে মাত্র দুদিন দু রাত্রি সময় প্রার্থনা করলো। কেননা 'শ্রাবণ' মাসের আর মাত্র দুদিন বাকী। এমন সময় নয়নরায় এসে রাজাকে সংবাদ দিল যে মোগলের সৈন্য সাথে নিয়ে চাঁদ পাল ত্রিপুরা দখল করতে আসছে। এই নয়নরায়কেই রাজা পূর্বে পদচ্যুত করেছিলেন। রাজার আদেশে আবার নয়নরায় সেনাবাহিনীর ভার নিলো। রাজা যুদ্ধে বের হবার সময় আবার সংবাদ পেলেন যে মোগল সেনাপতি নক্ষত্ররায়কে রাজপদে বরণ করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে নক্ষত্ররায়ের পত্রও এসে উপস্থিত। গোবিন্দমাণিক্য যদি স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ না করেন তবে নক্ষত্ররায় রক্তস্রোতে ত্রিপুরা রাজ্য প্লাবিত করবেন। ত্রিপুরা রমণীগণকে মোগলের অন্তঃপুরে বন্দিনী হতে হবে।

গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসন দণ্ড সাদরে গ্রহণ করলেন। অকারণ যুদ্ধের দ্বারা দেশে অশান্তি এনে লাভ কি? তাছাড়া তারই কনিষ্ঠ ভ্রাতাই তো রাজা হবেন। সমালোচক একরামদ্দীন তাঁর গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দমাণিক্যের এহেন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে এখানে রাজার দীপ্ত চরিত্র অল্প নিষ্প্রভ হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্য কি জানতেন না যে দুর্বল প্রকৃতি ও অস্থিরমতি নক্ষত্ররায় নামে মাত্র রাজা হবেন এবং মোগলেরাই সর্বেসর্বা হবে?...তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোবিন্দমাণিক্যের নিকট এ সকল বিষয় অজ্ঞাত থাকতে পারে না। এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হয়েও মোগলের প্রভুত্ব ও ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দান ও নক্ষত্রের সপক্ষে রাজ্যত্যাগ কি স্বদেশ হিতৈষী রাজার উপযুক্ত কার্য? স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যদি প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শ্রেয় হয় তবে সেই উদ্দেশ্যে সম্মুখযুদ্ধে ভ্রাতৃবধও নিন্দনীয় বলে মনে হয় না। মনে হয় মুহূর্তের জন্য ভ্রাতৃবধ কল্পনা রাজার হৃদয়কে দুর্বল ও দায়িত্বপূর্ণ করেছিল। এদিক থেকে সমালোচক নয়নরায়ের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,

"নয়নরায়ের ন্যায় প্রবল হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে আর কেহ নাই।"

বিপদ অকৃত্রিম প্রণয়বন্ধনকে দৃঢ়তর করে। রাজার বিপদে অনেকদিনের পর রাজা ও রানীতে সাদর সম্ভাষণ হলো বটে, কিন্তু "বলি নিষেধাজ্ঞা রূপ অন্তরায়" উভয়ের মধ্যে বর্তমান থাকায় পরস্পরের মিলন সম্পূর্ণ হলো না। রানী বললেন—

এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মত যাই নির্বাসনে?

রাজাও রানী গুণবতীর সংকল্প ত্যাগ করার জন্য অনেক অনুনয় করতে থাকেন, কিন্তু রানী শুনলেন না সে কথা। রানী চলে গেলেন তাঁর সম্মুখ থেকে। রাজা ভৃত্যগণকেও আহবান করলেন, তারাও সুসময়ের বন্ধু, অসময়ের নয়। গোবিন্দমাণিক্য একা পৈত্রিক রাজপ্রাসাদ থেকে বর্হিগত হলেন

মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি।...

সমালোচক একরামদ্দীন বলেন— গোবিন্দমাণিক্যের মুখে এহেন উক্তি দেবার সময় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মিল্টনের সেই অমর বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন:

The mind is its own place; and in itself
Can make a heaven of hell, a hell of heaven.

ষোড়শ পরিচ্ছেদে সমালোচক একরামদ্দীন অতি সুন্দরভাবে রঘুপতি চরিত্রের মনোলোকে প্রবেশ করেছেন। এই পরিচ্ছেদের নামকরণ এভাবে—"পিশাচের বাহ্য বলের প্রতিক্রিয়া"। জয়সিংহের গুরুভক্তির বন্ধন একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে, রঘুপতি সেটি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। এখন কেবল কৃতজ্ঞতার বন্ধনটুকু অবশিষ্ট আছে। তাকে আর আদেশ করতে রঘুপতির সাহস হয় না। শুধু একবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—শ্রাবণের শেষরাত্রে প্রতিজ্ঞা পালনের কথা। জয়সিংহের উত্তরে রঘুপতির অন্তর বিদীর্ণ হলো। কিন্তু জয়সিংহের কথার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হলো না রঘুপতি। জয়সিংহ বলে—

পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে।

'সব ঋণ শোধ' করার তাৎপর্য রঘুপতির কাছে অস্পষ্ট। শ্রাবণের শেষ রাত্রিতে জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। রঘুপতি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন--জয়সিংহ রাজরক্ত কই। জয়সিংহের মর্মস্পর্শী উক্তিতে রঘুপতি হতবাক—

আছে আছে! ছাড় মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।
রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

জয়সিংহ বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করে নিজেকে বলিরূপে নিবেদন করলো। রঘুপতি স্তম্ভিত এবং নিশ্চুপ হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। এই ঘটনা ঘটে গেল রাজা গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসনের পূর্বে। একরামদ্দীন এখানে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন: ''জয়সিংহের জীবনের ভার অসহ্য হইয়াছিল। তিনি আজীবন মিথ্যা দেবীর সাধনায় সমগ্র জীবনকে বিফল করিয়াছেন—এই রূপ একটা ভাব পূর্বেই তাহার হৃদয়কে কাতর করিয়াছিল। অতীত জীবন বিফল হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনও তাহার চক্ষে অন্ধকার বলিয়া মনে হইল।'' সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্যও লক্ষ করার মত: ''পিতা রঘুপতি পুত্র জয়সিংহকে ভক্তির সঙ্কীর্ণ পথে বন্দী করিতে যাইয়া তাহাকে হারাইলেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জয়সিংহের প্রেম ভ্রাতৃভাব দয়া আদি চিত্তবৃত্তির উপর চাপিয়া পড়িয়া তাহাদের স্বভাবিক স্ফূর্তি হইতে না দিলেও তাহারা রুদ্ধ অবস্থায় স্ফীত হইয়া বল সঞ্চয় করিতেছিল এবং শেষে যখন প্রভু শক্তি দৃপ্তভক্তি ও কৃতজ্ঞতা তাহাদিগকে স্বভাবের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত করিল তখন তাহারা বিদ্রোহী হইয়া আদেশ দাতা প্রভুভক্তিকে বিনাশ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত সন্ধি করিল।'' (পৃ ৯৫)

জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের পর অপর্ণা মন্দিরে এসে উপস্থিত। রঘুপতির হৃদয়ে আর অপর্ণার প্রতি বিদ্বেষ নাই। তার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হলো। রঘুপতি বলে ওঠেন:

আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

প্রতিমার পদতলে মাথা রেখে রঘুপতি শেষবারের মত চিৎকার করে ওঠেন—

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

এখানে নাটক তার চরম অবস্থা বা Climax-এ পৌছে গেছে। রঘুপতি রাজ-দর্প চূর্ণ করার জন্য যে বাহ্য শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তা প্রতিহত হয়ে এসে তারই মর্মমূলে আঘাত হানলো।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাবেন। রানী গুণবতী আবার পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। এদিকে নবাগত রাজাকে সম্ভবত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাদ্য বেজে উঠলো। কিন্তু রানী বুঝতে পারেন নি—

বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে। আন্ বলি।
আন্ জবা ফুল।...

রাজ্যহীনা রানীর আদেশ কেউ গ্রাহ্য করল না—

আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিংকর-কিংকরী?

এস্থলে সমালোচক একরামদ্দীনের মন্তব্য লক্ষ্য করুনঃ ''ফুলে মধু নাই মধুপের দল ফিরিয়াও চাহিবে না। এতটুকু মধুও কি বাকী নাই যাহা আর একটিবার মাত্র মধুপের দলকে ফিরাইতে পারে।'' (পৃ ৯৯-১০০)
রানী বললেনঃ

এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী
এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা ক'রে
কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার।

রানীর গর্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। শেষে তিনি বললেন--'মহামায়া এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।'এদিকে মন্দিরমধ্যে রঘুপতি দেবীর কাছে বারংবার চিৎকার করছেন—জয়সিংহকে ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও। দেবী তো কোন কথা বলে না।

দেখো দেখো কি করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মত।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির!..

দেবী আর এখন রঘুপতির কাছে দেবী নয়--তা প্রাণহীন পাষাণের স্তূপ--তার প্রাণ থাকলে সে সেবক রঘুপতির বেদনায় বিচলিত হতো—বুদ্ধি থাকলে তার যাতনা বুঝতে পারতো—বাক্‌শক্তি থাকলে তার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতো। রঘুপতির মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলো—

কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।

শেষ পর্যন্ত রঘুপতি প্রতিমাকে গোমতী নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন। রঘুপতির চরিত্র সম্পর্কে, তার মনোজগতের বিচিত্র অবস্থার বর্ণনা ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমালোচক এভাবেঃ

> শোকে রঘুপতির কঠোর হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কোমল ও কঠোর হৃদয়ের বিশেষ প্রভেদ এই যে স্নেহ মমতা শোক দুঃখ আদি কোমল প্রবৃত্তিগুলো কোমল হৃদয়ে যেমন সহজে প্রবেশ লাভ করে তেমনি সহজেই নিষ্ক্রান্ত হয় এবং কঠোর হৃদয়ে যেমন কষ্টে প্রবেশ লাভ করে--তেমনি একবার প্রবেশ করিলে সহজে বাহির হইতে পারে না।...কঠোর হৃদয়ের প্রতিহিংসাও ভয়ঙ্কর। জয়সিংহের রক্তপাতের পরিবর্তে রঘুপতি দেবীকে বাহ্যমন্দির ও মনোমন্দির হইতে বিসর্জন দিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিলেন। ...দেবী বিসর্জিত হইলেন। এই নিমিত্ত পুস্তকের নাম বিসর্জন--কিন্তু এই বিসর্জন ঘটাইতে অনেককে অনেক বিসর্জন করিতে হইল। (পৃ ১০২)

মন্দিরে পূজার জন্য তখনও গুণবতী মন্দিরে উপস্থিত। কিন্তু দেবী কোথায়। রানী রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—''দেবী কই?''রঘুপতি উত্তর দিলেন—'দেবী নাই।'' রানী বললেন—

ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষশান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মা'র পূজা
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার।...

রঘুপতিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করে রানী গুণবতী একই উত্তর পেলেন—দেবী নাই।' রঘুপতি বারবার বলেন—দেবী নাই'। শেষে বলেন, 'কেহ নাই। কিছু নাই।' নাস্তিকতার দৃঢ়তায় রানীর মনেও প্রত্যয় হলো যে দেবী নাই। তার এবং রাজার মাঝখানে যে দেবীরূপিণী যবনিকা ছিল তা হঠাৎ অপসৃত হওয়ায় রানীর হৃদয় রাজার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো। রানী বলে ওঠেন:

নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা, ফিরে যা!
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

তখন মন্দিরে অপর্না প্রবেশ করে রঘুপতিকে পিতা বলে আহবান করলেন—রঘুপতিও পিতা আহবানে বিগলিত হয়ে ওঠেন:

জননী, জননী, জননী আমার
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে-- পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা ডাক্ আরবার!

অপর্ণা আবার বলে: পিতা চলে এসো। রঘুপতির মনে তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়:

পাষাণ ভাঙিয়া গেল -জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!

নাটকের এইখানে পরিসমাপ্তি।

নাটকের প্রথম সংস্করণ আর বর্তমান সংস্করণে একটু পরিবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ দৃশ্যে এই পরিবর্তনটুকু করেছিলেন। দেবীর মন্দিরেই রানীর সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের মিলন দেখিয়েছেন। প্রথম সংস্করণে এ দৃশ্যটি ছিল না। একরামদ্দীন এ পরিবর্তনটুকু সমর্থন করেন নি।'*রবীন্দ্র-প্রতিভা*' গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় একরামদ্দীন লিখেছেন:

> এই পুস্তক যন্ত্রস্থ হইবার উপক্রম হইতেছে এরূপ সময়ে রতন লাইব্রেরীতে দেখিলাম 'বিসর্জন'–এর পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ দেবীমন্দির মধ্যেই রানীর সহিত রাজার পুনর্মিলন ঘটাইয়াছেন।...
> আমার মনে হয় পরবর্তী সংস্করণে রাজার সহিত রানীর এই মিলনে কাব্যনীতির সমুচিত সম্মান রক্ষা হয় নাই। গুণবতীর পতিপ্রেমের কখনও খর্বতা না হইলেও তিনি পত্নীর কর্তব্যে যে ত্রুটি করিয়াছিলেন তাহার ফলে পতির জন্য কিছু কাল উৎকণ্ঠিত অবস্থায় যাপন করিয়া তাহার দণ্ডভোগ হওয়া উচিত ছিল। যে গুণবতী স্বামীর নির্বাসন গমনের সময় স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া দূরে থাকুক স্বামীর প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করেন নাই সেই গুণবতী এরূপ অনায়াস লব্ধ মিলনের উপযুক্ত নহেন।...আমার মতে রবীন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থের এই পরিবর্তন দ্বারা কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে কিঞ্চিৎ শ্রীহীন করিয়াছে।''

'*বিসর্জন*' নাটক রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকে নাটকাকারে রচিত হয় এবং ১২৯৭ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০৩ সালে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থাবলী'র সংস্করণে '*বিসর্জনের*' বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেকগুলি চরিত্রও পরিত্যক্ত হয়। যেমন—হাসি, হাসির কাকা, কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধ পিতা। ১৩০৬ সালে '*বিসর্জন*'–এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ''পুষ্প অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ'' ও তৎপরবর্তী অংশের যোজনা করা হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্করণটি প্রচলিত। এটি রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় আছে।

সমালোচক একরামদ্দীন ১৩০৬ সালের দ্বিতীয় সংস্করণটি তার সমালোচনা লিখিত হবার পরে দেখেছিলেন মনে হয়। বলা বাহুল্য, একরামদ্দীনের সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। সে যা হোক, একরামদ্দীনের মন্তব্যটি লক্ষ্য করার মত: ''রানীর সঙ্গে রাজার মিলন দেখানোটা এমন কিছু জরুরী ছিল না। আসল কথা রানীর চৈতন্যোদয় হওয়াই বড় কথা ছিল।''

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে একরামদ্দীন সমগ্র '*বিসর্জন*' নাটকটি সম্পর্কে কিছু সাধারণ মন্তব্য করেছেন। এ অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন সমালোচক এভাবে– ''মানব সমাজের স্বার্থপরতা''। একরামদ্দীন বলছেন:

> আমরা বিসর্জনে কি দেখিলাম—আমরা দেখিলাম নূতনের সহিত পুরাতনের, সত্যের সহিত মিথ্যার—যোগ্যতার সহিত

> অযোগ্যতার—দেবের সহিত পিশাচের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত মিথ্যা পুরাতন ধর্মকে সাধারণে সংস্কারবশতঃ বংশ পরম্পরায় সত্য ধর্ম রূপে গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। মানুষের স্বভাব এইযে তাহাকে কিছুতে ধাক্কা না দিলে ছাড়িতে চায় না। বহু পূর্বে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল—কিন্তু যখন বিদ্রোহী নরবলি ও তাহার আত্মীয়স্বজনের মর্মন্তুদ অভিযোগ সাধারণের শান্তি-সুখে ব্যাঘাত ঘটাইয়া ধর্ম সংস্কারের আবশ্যকতা আনয়ন করিল তখন নরবলি প্রথা পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু মূক পশু শিশু বিদ্রোহী হইতে জানেনা সুতরাং পশুবলির অন্যায্যতা সম্বন্ধে কাহারও হৃদয়ে কোন দিন সন্দেহের উদয় হইলনা। নরবলি মানবের স্বার্থের বিরোধী দেখিয়া মানব তাহা পরিত্যাগ করিল; কিন্তু পশুবলি উপাদেয় খাদ্যরূপে স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল হওয়ায় তাহা রক্ষিত হইল। [পৃ১০৭]

বিংশিত পরিচ্ছেদে অপর্ণার কথা বলা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে—'সমাজচ্যুতা অপর্ণা।' সমাজচ্যুতা ভিখারিণী বালিকা অপর্ণা মনুষ্য সমাজে বাস করেও একাকিনী; তার আপনার বলতে কেউ ছিলনা। তাই অপর্ণার সমস্ত স্নেহ একটি 'মা-হারা' ছাগ শিশুকে আশ্রয় করেছিল।

অপর্ণা এই গ্রন্থের নায়িকা। রবীন্দ্রনাথ তার অন্তঃসৌন্দর্যের চিত্রখানি পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে ধরেছেন। তার বাহ্য সৌন্দর্যের কিছু মাত্র পরিচয় প্রদান করেন নি। একরামদ্দীন এখানে নারীর সৌন্দর্যের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে নারীর সৌন্দর্যকে সাধারণত দীপ্তিমান, কোমল ও গম্ভীর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। দীপ্তিমান সৌন্দর্য পুরুষের হৃদয়ে তীব্র মিলন ব্যাকুলতা, কোমল সৌন্দর্য সহৃদয়তা এবং গম্ভীর সৌন্দর্য তন্ময়তা আনয়ন করে। দীপ্তিমান সৌন্দর্য পশু প্রবৃত্তি, কোমল সৌন্দর্য সহানুভূতি; গম্ভীর সৌন্দর্য পবিত্র ভক্তিভাবের উদ্রেক করে। দীপ্তিমান সৌন্দর্যের অধিকারিণী মোহিনীরূপে আকাঙক্ষার পরিতৃপ্তি কামনা করে। কোমল সৌন্দর্যের অধিকারিনী ভিখারিণী রূপে কৃপা ভিক্ষা করে এবং গম্ভীর সৌন্দর্যের অধিকারিণী দেবীরূপে পুরুষকে সেবকের আসনে গ্রহণ করে ভক্তি অর্ঘ আনয়নের জন্য আদেশ প্রদান করে। সমালোচক একরামদ্দীন আরো বলেন:

জগতে নারী রূপে এক শ্রেণীর অবিমিশ্র সৌন্দর্য কৃচিৎ দৃষ্ট হয়। তাহাতে প্রায়ই দুই বা তিনশ্রেণীর গুণই কিছু কিছু মিশ্রিত দৃষ্ট হয়। এরূপ মিশ্রিত সৌন্দর্যে যে শ্রেণীর গুণের আধিক্য থাকে আমরা তাকে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে গ্রহণ করতে পারি।

অপর্ণার সৌন্দর্য কোন্ শ্রেণীর আমরা তার স্বভাব বা চরিত্র থেকে অনুমান করতে পারি। অপর্ণা সরলা বালিকা, সে তার হৃদয়ের ভাব গোপন করতে জানে না। সে সরলতা নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার জননী। সে অকপটে নির্ভীকতার সঙ্গে রক্ত পিপাসিনী দেবীকে সর্ব প্রথমে রাক্ষসী নামে অভিহিত করে প্রচলিত ধর্মের বিরোধী হতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করে নি। অব্রাহ্মণ হয়েও তেজস্বী ব্রাহ্মণ রঘুপতিকেও অভিসম্পাত প্রদান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অপর্ণা সহৃদয়া—ইতর প্রাণীর দুঃখেও অকপট সহানুভূতি প্রকাশ করে। অপর্ণা বুদ্ধিমতী, সে প্রতিমাকে বিমুখ দেখা মাত্র বুঝতে পারল—প্রতিমার নিজের মুখ ফিরাবার ক্ষমতা নাই। মানুষে এরূপ করেছে এবং মানুষের দ্বারাই বা আবার পূর্বভাবে স্থাপিত হতে পারে। অব্যক্তভাব প্রকাশে চক্ষুই শ্রেষ্ঠ, তাই মূক ছাগশিশুর হৃদি ব্যাকুলতার চিত্র অঙ্কনের নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথকে 'ব্যাকুল নয়নের' আশ্রয় নিতে হয়েছে।

অপর্ণার সহৃদয়তা, সরলতা, তেজস্বিতা, ও বুদ্ধিমত্তা এই চারটি প্রধান গুণ ও তাদের একটি স্থায়ী প্রতিকৃতি অপর্ণার চেহারায় অঙ্কিত করে দিয়েছিল। তার সহৃদয়তা ও সরলতা তার সৌন্দর্যকে কোমলতাময় করেছিল, তার তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা তাতে জ্যোতি সমাবেশ করেছিল। কোমলতার প্রতিমূর্তি অপর্ণাকে দেখা মাত্র সহানুভূতি বিশিষ্ট পুরুষের হৃদয় স্বভাবতঃই করুণাপূর্ণ হতো—তার উপর অপর্ণা যখন স্বয়ং করুণভাবে উত্তেজিত হতেন তার মুখমন্ডলে প্রতিফলিত হৃদয়ের ভাবে পুরুষের করুণাধারা উছলে উঠতো। অপর্ণার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করল যে, জীবজননীর হৃদয়ও মাতৃভাব শূন্য নয়। রাজা গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার কাছ থেকে পেলো 'সত্যের আলোক'—অপর্ণার হৃদয় থেকে রাজার হৃদয়ে তা প্রতিফলিত হলো। [একবিংশতি পরিচ্ছেদ—পৃ ১১৫] রাজা নিজেই স্বীকার করেন:

বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহেনা তাঁহার।

অপর্ণা সর্ব প্রথমে দেবীর পিশাচভাবের পরিচয় প্রকাশ করে বলেছিল এই যে দেবীর দেবীত্ব তা সাধারণ মানুষের কল্পিত, মানুষের আরোপিত।

অপর্ণা সরল বুদ্ধিতে তাই বুঝতে পেরেছিল—

মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়সিংহের মনেও এই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। দেবী কি বাস্তবিকই দেবী, না দেবীর ছদ্মবেশে পিশাচী। এস্থলে সমালোচক একরামদ্দীনের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: ''দেবী দেবী হউন বা পিশাচী হউন তাহাতে দেবীর কোন অপরাধ নাই—কারণ দেবী সাধারণ মানব হৃদয়েরই প্রতিকৃতি মাত্র। মানুষের স্বভাব দেবীকে যে রূপ ও প্রকৃতি দিয়েছে দেবী তাহারই মাত্র অধিকারিণী। (পৃ ১১৬)

রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হলেও তার পিশাচভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়নি; এইজন্য তিনি দেবভাব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও পাশব পৈশাচিক বলের আশ্রয় গ্রহণ করে বক্রপথ অবলম্বন করলেন। দেবভাব অন্তঃশক্তি দ্বারা জয়লাভ করবে—তার পৈশাচিক বাহ্য শক্তির আবশ্যকতা কি? প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচক একরামদ্দীন। বাহ্যশক্তির উপর অধিকার স্থাপনে বাহ্যশক্তির প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু অন্তর অধিকারে কেবল অন্তঃশক্তির প্রয়োজন। সমালোচকের এই মন্তব্যের সঙ্গে পাঠকগণও নিশ্চয়ই একমত হবেন। এ প্রসঙ্গে একরামদ্দীনের নিম্নোক্ত মন্তব্য অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বিশ্লেষণে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচক একরামদ্দীনেরও সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ক্ষমতার পরিচায়ক। একরামদ্দীন বলেন:

> নব সত্য ধর্ম অতিথিরূপে মানবের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলিবে--আমি সত্য আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে ভাল করিয়া দেখ--আমার রূপ আছে, আমার গুণ আছে—আমাকে চিনিতে পারিলেই— তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে। কেহ তাহাকে গ্রহণ করিবে— কেহবা করিবেনা। কিন্তু অতিথি যদি গৃহস্বামীকে বলপূর্বক তাড়াইয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে চায় তাহা হইলে প্রত্যেক গৃহস্বামীই তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে।... নব সত্যধর্ম যদি সমাজ বিপ্লব না আনিয়া কৃতকার্য হইতে চায়, তবে তাহাকে সমস্ত বাহ্যবলের সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। সে যদি বলে--আমার বাহ্যবল আছে, থাকুক, আমি বাহ্য বল প্রয়োগ করিবনা। আমার রূপ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হও। এই কথায় কেহ ভ্রূক্ষেপ করিবেনা বরং মনে করিবে যে সে প্রতারণার দ্বারা কার্য

> সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। এই নিমিত্ত বাহ্য শক্তি সম্রাট কখনও ধর্মপ্রচারকের আসন গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। রাজকুমার শুদ্ধোধণ সম্পূর্ণরূপে রাজসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্য প্রচারে ব্রতী না হইলে সত্য ধর্মের জনক রূপে কোটি কোটি মানবের পূজাযোগ্য হইতেন না। [পৃ ১১৮-১১৯]

বাহ্যশক্তিসম্পন্ন রাজা গোবিন্দমাণিক্য বাহ্যশক্তিকে নিশ্চেষ্ট না রেখে তারই সাহায্যে সত্য ধর্ম প্রচারের সঙ্কল্প করলেন। সর্ব প্রথমে রাজশক্তি বলি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করলো—পরে বলিদান নিবারণের জন্য মন্দিরে সৈন্য প্রহরী নিযুক্ত হলো। এর ফলে সবাই রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলো। প্রেয়সী বিমুখ, ভ্রাতা গুপ্ত হত্যার প্রয়াসী, মন্ত্রী প্রতিবাদী, সেনাপতি বিরোধী। পুরোহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী আর জনতা ছিদ্রান্বেষী হলো। রাজ অন্তঃপুরে অপ্রসন্নতা, রাজসভার প্রতিকূলতা, রাজপথে ভক্তিহীনতা, রাজমন্দিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজাকে বেষ্টন করে রাখলো। তবু রাজা ধীর স্থির, সত্যপ্রিয়তার আলোকবর্তিকা নিয়ে একা পথ চলেছেন। এদিকে রঘুপতি রাজার বিনাশ সাধান তার প্রাণাধিক পালিত পুত্র জয়সিংহকে হারালেন। সামলোচক একরামদ্দীন দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদের শেষে [পৃ ১২২] একটি অতি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন:

> আমরা অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ দেখতে চাই— এই জন্য 'বিসর্জন' নাটকে সত্যের আংশিক জয়ে আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকি। কিন্তু আমরা হৃদয়কে এই বলে প্রবোধ দিতে পারবো যে ''সত্যের জয় একদিনে এক বৎসরে বা এক সহস্র বৎসরেও সম্পূর্ণ হয় না—তার অপ্রতিহত শক্তি ধীর ও নিশ্চিত পদক্ষেপ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে।''

একরামদ্দীনের মন্তব্য সম্পর্কে আমরাও একমত। *'বিসর্জন'* নাটকে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র চিত্রণ অতি চমৎকার হয়েছে বলা যায়। মানবজীবনের সমস্যা ও সংকটকে রবীন্দ্রনাথ নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিপুণ চিত্রকর—তাঁর কার্য প্রতিকৃতি অঙ্কন। নাটকের চরিত্রগুলি দিবালোকে পাঠকের নয়ন সম্মুখে আবরণ ত্যাগ করে—আত্মপ্রকাশ করেছে। অঙ্গুলী নির্দেশে স্ব স্ব কলঙ্ক ও সৌন্দর্য সবই দেখিয়ে দিয়েছে। একরামদ্দীন রবীন্দ্রনাথের সুচারু ভাষারও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় যুক্তিপ্রধান—ভাবপ্রধান নহে। ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদে মাইকেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা

করেছেন। ''মাইকেলের হুঙ্কারে হৃদয় শঙ্কিত ও জাগ্রত হয়—রবীন্দ্রনাথের সংযুত ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জরণে হৃদয়ে মোহিত ও তন্ময় হয়। মাইকেলের ভাষা এরূপ:

অনুমতি দেহ সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজ। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।

আর রবীন্দ্রনাথ বলেন:

নিভৃত নিলয় মুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা
মিলন মুদিত বুকে
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল
চাহিবনা মুখে মুখে।''

ভাষার বহিরঙ্গ সম্পর্কে অবশ্য সমালোচক একরামদ্দীন কোন মন্তব্য করেননি। অর্থাৎ ছন্দ। অলংকার শব্দ প্রয়োগের দিকে সমালোচক তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আলোচনা করেন নি। কেন সমালোচক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন তা আমাদের বোধগম্য হলো না।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে ''*রবীন্দ্র–প্রতিভা*'' গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে সমালোচক নায়ক–নায়িকার নামকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের নামকরণ নির্দোষ হয়েছে। ন্যায় ও ধর্মের প্রতিমূর্তি রাজাকে গোবিন্দমাণিক্য বললে অত্যুক্তি হয় না। অপর্ণা দেবী ও ভিখারিণীর উপযুক্ত পরিচয়। গুণবতীতে কলঙ্ক আছে—কিন্তু সতীত্ব গুণে তাকে গুণবতী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নক্ষত্ররায় ব্যক্তিত্বহীন—অনেক নক্ষত্রের যেমন--নিজের আলো নেই—তারা ধার করা আলোকে প্রকাশিত হয়। পৌরাণিক রঘুপতি নাম পুরাতনের প্রতিনিধি ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত।জয়সিংহ রঘুপতিকে প্রত্যাখ্যান করে আত্মনাম সার্থক করেছে।

একরামদ্দীনের গ্রন্থের শেষ মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: ''রবীন্দ্রনাথে ভাব বিশ্লেষণ শব্দ যোজন ও নামকরণে সকলের সমবেত শক্তি চরিত্র–চিত্রণরূপ একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী—'' [পৃ ১২৯]

নাটক বা উপন্যাসের মূল লক্ষ্য চরিত্র–চিত্রণ। রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটিই সুসম্পন্ন করেছেন অত্যাশ্চর্য দক্ষতার সাথে। '*বিসর্জন*' নাটক সম্পর্কে ১২৯

পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনায় সমালোচক একরামদ্দীনের রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী সমালোচকবৃন্দ একরামদ্দীনের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা থেকেই প্রেরণা লাভ করেছেন—সে কথা বলাই বাহুল্য যদিও অনেক সমালোচক অতি কৌশলে একরামদ্দীনের নাম এড়িয়ে গেছেন।[৩]

তথ্য নির্দেশ

১ একরামদ্দীনের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দৃষ্ট হয়। ফলে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়না। ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত একরামদ্দীনের জীবনী গ্রন্থে তাঁর জন্মতারিখ দেওয়া হয়েছে ১৮৭২--অথচ উক্ত পুস্তকেরই কভার পৃষ্ঠায় ১৮৮২ সাল মুদ্রিত হয়েছে। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে জন্মতারিখ দেওয়া হয়েছে ১৮৮০ সাল। তাঁর মৃত্যু তারিখ বলা হয়েছে ১৯৪০ সালের ২০ শে নভেম্বর [দ্রষ্টব্য: ওয়াকিল আহমদ-একরামদ্দীন, ঢাকা, পৃ ৬৫]। হাই ও আহসানের গ্রন্থে মৃত্যু তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৩৫ সাল [দ্রষ্টব্য: হাই ও আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত:* তৃতীয় সং, পৃ ২১৭]

২ রবীন্দ্রনাথের আদি সমালোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিনয়কুমার সরকার, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকুমার কর ও সমরেন্দ্র রায়। অজিতকুমার চক্রবর্তীর দুটি গ্রন্থ--একটি *কাব্য পরিক্রমা* ও অপরটি *রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ* ১৩১৯ সালে প্রকাশিত। *কাব্যপরিক্রমা* ১৩২২ সালে প্রকাশিত। এ গ্রন্থে আছে--জীবন দেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবন স্মৃতি ছিন্নপত্র, ধর্ম সংগীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য সম্পর্কে আলোচনা।
বিনয়কুমার সরকারের গ্রন্থের নাম *রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতীয় বাণী।* প্রকাশকাল--১৩২০ বা ১৯১৩। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের নাম--*কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব*, উপেন্দ্রকুমার করের গ্রন্থ হচ্ছে *গীতাঞ্জলি সমালোচনা'* (১৩২১)। এ তালিকা
থেকেই বুঝা যায় একরামদ্দীনের *রবীন্দ্র-প্রতিভা* (বিসর্জন) রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকের একেবারে আদি সমালোচনা গ্রন্থ।

৩ পরবর্তী সমালোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অজিত ঘোষ, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী। এরা কেউই তাঁদের গ্রন্থে একরামদ্দীনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। শুধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রবি রশ্মি* (প্রকাশকাল ১৩৪৪) গ্রন্থে *'বিসর্জন'* নাটকের আলোচনার শেষে একরামদ্দীনের *'রবীন্দ্র--প্রতিভা'* গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র। দ্রষ্টব্য: রবিরশ্মি, *পূর্বভাগ*, ১৩৪৪, পৃ ২৫২, প্রকাশক এ মুখার্জি, কলিকাতা] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের' *রবীন্দ্র জীবনীর* (১ম খন্ড, ১৩৪০) ২৬০-২৬৩ পৃষ্ঠায় *'বিসর্জনের'* আলোচনা আছে, কিন্তু একরামদ্দীনের নামের উল্লেখ নেই।